ডিজিটাল বিপ্লবীদের দেশে

মোস্তাফা জব্বার
মন্ত্রী
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও
তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

২০১৯ সালে স্পেনের বার্সিলোনায় আয়োজিত বিশ্ব মোবাইল কংগ্রেসের ৮ নাম্বার হলে আমাদের এক টুকরো বাংলাদেশ–রিভ সিস্টেমের স্টল দেখতে যাবার পথে করিডোরের বা দিকে হঠাৎ একটি বাক্য দেখে চোখ আটকে গিয়েছিল। বাক্যটির বাংলা অর্থ হচ্ছে কাতালুনিয়া: ডিজিটাল বিপ্লবীদের দেশ। এর আগে আর কোথাও বা কখনও ডিজিটাল বিপ্লবী শব্দ দুটি দেখিনি বা শুনিনি। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ, ডিজিটাল ব্রিটেন, ডিজিটাল পাকিস্তান বা ডিজিটাল ভিয়েতনাম বা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা শুনেছি। কিন্তু ডিজিটাল রূপান্তরের জন্য ডিজিটাল বিপ্লবী হওয়া যায় এই ধারণাটি কাতালুনিয়াতেই প্রথম পেলাম। '১৯ সালে স্পেনের কাতালুনিয়ার বার্সিলোনায় যাবার মতোই '১৮ সালে বার্সিলোনায় যাই যখন প্রথ মবারের মতো আমার সাথে দেখা হয় মোবাইলের পঞ্চম প্রযুক্তির সাথে। সেই প্রযুক্তির নাম ৫জি যাকে আমার কাছে এক অসাধারণ, অভাবনীয় ডিজিটাল প্রযুক্তি বলে মনে হয়েছে। '৮৭ সালের ২৮ এপ্রিল কমপিউটারের বোতাম ছুয়ে যে নতুন জগতে পা রেখেছিলাম তার সর্বশেষ পরশ এই ৫জিতে পেয়েছিলাম। সেই বছরই গিয়েছিলাম জাপানে-জাপান আইটি উইকে। সেদিন মনে হয়েছিল, সেটি যেন বার্সিলোনার পরের সিঁড়ি। এটি খুব স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, এই দুটি সফরতো বটেই '১৯ সালে আবারও মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে যোগদান বা সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় উইসিস ফোরামে চেয়ারম্যান হবার কোনো ঘটনাই ঘটতো না যদি '১৮ সালের ২ জানুয়ারি থেকে আমি সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন না করতাম। মাঝখানে এক মাসের বিরতি দিয়ে আমার পছন্দের বিষয় ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে আমার কয়েকটি ভ্রমণের বিষয়গুলো নিজের চিন্তা ভাবনার সাথে যুক্ত বলে এর কাহিনীগুলো লিখে রাখা দরকার বলেই মনে করছি। কোন এক সময়ে এই ভ্রমণসমূহের অভিজ্ঞতা ইতিহাসের বাইরেও কিছু নবীনতম উপাত্তের যোগান দিতে পারে।

স্পেন পরিচিতি : অবস্থান : স্পেন বা স্পেন রাজ্য ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র। শাসনব্যবস্থার ধরন অনুযায়ী দেশটি একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। এটি ইবেরীয় উপদ্বীপের প্রায় ৮৫ শতাংশ এলাকা জুড়ে অবস্থিত। উপদ্বীপটির বাকি অংশে স্পেনের ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশী রাষ্ট্র পর্তুগাল এবং ব্রিটিশ প্রশাসনিক অঞ্চল জিব্রাল্টার অবস্থিত। আয়তন : স্পেনের আয়তন ৫,০৫,৯৯০ বর্গ কিমি। আয়তনের বিচারে রাশিয়া, ইউক্রেন ও ফ্রান্সের পরে স্পেন ইউরোপের চতুর্থ বৃহত্তম এবং দক্ষিণ ইউরোপের বৃহত্তম দেশ। রাজধানী : মাদ্রিদ স্পেনের বৃহত্তম শহর ও রাজধানী। বার্সেলোনা, বালেন্সিয়া, সেবিইয়া, বিলবাও এবং মালাগা অন্যান্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। ভাষা : স্পেনে স্পেনীয় ভাষা ছাড়াও প্রদেশভেদে আরও ৪টি ভাষাকে সহ-সরকারি ভাষার মর্যাদা দেয়া হয়েছে; এগুলো হলো কাতালান, গালিসীয়, বাস্ক এবং অক্সিতঁ ভাষাসমূহ। জনসংখ্যা : স্পেনের জনসংখ্যা ৮ কোটি ২৭ লাখ ১৭ হাজার। এরা মূলত কাস্তিলীয় স্পেনীয় জাতের মানুষ। দেশটির সাথে অন্যান্য দেশের সুসম্পর্ক রয়েছে। এই দেশের পাসপোর্টে ১২৩টি দেশে বিনা ভিসায় ভ্রমণ করা যায়, যা পাসপোর্ট শক্তি সূচকে ৩য় স্থানে রয়েছে। দেশটির সরকারী ভাষা কাস্তিলীয় স্পেনীয় ভাষা। ধর্ম : সারা দেশে ৯৬ শতাংশ নাগরিক ক্যাথলিক খ্রিস্টান। শিক্ষার হার : ৯৮.২৫ শতাংশ। মাথাপিছু আয় : ৩২,৫৫৯ মার্কিন ডলার। মোট জিডিপি ১.৫০৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ডিজিটাল বিপ্লবী : যৌবনকাল থেকে বিপ্লবী শব্দটির সাথে আমি এবং আমাদের প্রজন্ম বেশ পরিচিত। বলতে পারেন পছন্দেরও শব্দ। এক সময়ে যারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে তুং-এর চিন্তাধারায় ভাবতেন, যারা হো চি মিন বা চে গুয়েভারাকে নায়ক বলে মনে করতেন কিংবা গেরিলা হবেন বলে রেজিস দেবরের বই পড়তেন, তারা কখনও কখনও বিপ্লবী নামে অভিহিত হতেন।

সেই বিপ্লব মানে ছিল কমিউনিজমের লড়াই, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, পুজিবাদের পতন ঘটানো বা সাম্যবাদের জন্য সংগ্রাম করা। কার্ল মার্কসের তত্ত্ব নিয়ে এর বিস্তৃতি ঘটেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বা মাও সেতুং এর চিন্তাভাবনাকে বিশ্বজুড়ে বিপ্লব বলে আখ্যা দেয়া হতো। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এর প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সেটি পূর্ব ইউরোপে প্রসারিত হয়। এর পরের দৃষ্টান্ত চীনের এবং মাও সে তুং সেই বিপ্লবের নায়ক। বর্তমান বিশ্বে বস্তুত রাশিয়া বা পূর্ব ইউরোপকে সমাজতন্ত্রের বাহক মনে করা হয় না। চীনকে মনে করা হয় একটি মিশ্র অর্থনীতির দেশ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর সাথে পুঁজিবাদের কিছু কিছু বিষয়কে সমন্বিত করায় চীন সমাজতন্ত্রের এক নতুন রূপ তুলে ধরেছে বলে দাবি করে। সেই সূত্রে বিপ্লব মানে বিদ্রোহ, গেরিলা যুদ্ধ, আমূল পরিবর্তন, বিচ্ছিন্নতাবাদী বা স্বাধীনতার আন্দোলন। কাতালুনিয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী বা স্বাধীনতার আন্দোলন করছে বিধায় তাদেরকে সাধারণ অর্থে তেমন কোনো বিপ্লবী বলাই যেতো। কিন্তু তাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ের ইতিহাস আমাদের মতো স্বাধীনতার লড়াইকারীদের জন্য তেমন জুতসই মনে হয় না। মিটিং নাই, মিছিল নাই, গুলি নাই, বারুদ নাই রক্ত, যুদ্ধ আর অস্ত্র নাই এসবকে কি আর স্বাধীনতার লড়াই বলা যায়! স্বাধীনতাকামী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী কাতালুনিয়া সম্পর্কে খুব সহজেই ইন্টারনেটে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে, প্রচলিত ধারার বিপ্লবে তাদের তেমন খুব একটা আগ্রহ নাই। উইকিপিডিয়া থেকে জানা যায়, কাতালুনিয়ায় একটি

বিতর্কিত নির্বাচন পদ্ধতিতে স্বাধীনতার গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ২০১৭ সালের ১ অক্টোবর। স্পেনের সাংবিধানিক আদালত ১৯৭৮ সালের সংবিধান লঙ্ঘন করার দায়ে গণভোট বাতিল করে দেয়। এরই প্রেক্ষিতে ২৭ অক্টোবর ১৭ প্রতিকী স্বাধীনতা ঘোষণা করে কাতালুনিয়ার সংসদ। এর পরপরই সংসদ ভেঙে দিয়ে কাতালুনিয়ায় স্পেনের কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাতালুনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা বিদেশ পালিয়ে যান ও অনেক নেতা জেলে ঢুকেন। ১৫ মে ২০১৮ কুইম টোরা কাতালুনিয়ার ১৩১তম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অভিনন্দন কাতালুনিয়াকে যে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পথের বদলে ডিজিটাল বিপ্লবের পথ ধরেছে।

সচরাচর ক্ষমতাসীন সরকার/আধিপত্যবাদী/দখলদার বা ঔপনিবেশবাদীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বা স্বাধীনতাকামী যুদ্ধকে দমন করে থাকে। অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে এইসব দৃষ্টান্তের কমতি নাই। তবে কাতালুনিয়ায় ওরা যে বিপ্লবের স্লোগান দিয়েছে সেটিকে প্রচলিত ধারার বিপ্লবের মতো ব্যাখ্যা করা যাবেনা। কারণ ওরা সমাজতান্ত্রিক বা স্বাধীনতার বিপ্লবের কথা নয়, ডিজিটাল বিপ্লবের কথা বলছে। তাদের কোন কার্ল মার্কস, লেনিন, মাও সে তুং বা হো চি মিন নেই। তাদের নাই স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার। তাদের একটা বঙ্গবন্ধু থাকলেও কথা ছিল। কিন্তু মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেস তাদেরকে এটি বোঝাতে পেরেছে যে, দুনিয়ায় অন্যরকম একটা বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যাচ্ছে। সেই বিপ্লব মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক নয়, তবে দুনিয়া বদলে দেবার মতো একটি বিপ্লব তো বটেই। কাতালুনিয়ানদের জন্য এই বিপ্লবী হবার ঘোষণা দানে অন্তত এটি বোঝা গেলো যে, তাদের মাথায় এখন একটি আলাদা দেশ হবার চাইতে ডিজিটাল বিপ্লব করাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বহমান জীবনে ডিজিটাল প্রযুক্তির আসন্ন প্রভাবকে স্বাগত জানাতে পারার এই সক্ষমতাকে আমি অবশ্যই ইতিবাচক হিসেবে দেখি।

মানবসভ্যতার বিকাশে মার্কসবাদের মূল লক্ষ্যকে সামনে রাখলে এটি ভাবা একদমই বেঠিক হবে না যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা, জনগণের জীবনমান উন্নত করা, দারিদ্র দূর করা বা সমতা আনার কাজটি করার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ডিজিটাল বিপ্লবীরা দুনিয়াটাকে বদলাতেই পারে। আমি নিজে সমতায় বিশ্বাস করি। যদিও এটি মনে করি যে মার্ক্সকে এই যুগের বিপ্লবী তত্ত্বের গরু মনে করা যাবেনা। মার্কসের সমাজতন্ত্র সরাসরি চতুর্থশিল্পবের উপযোগী নয় বরং মার্কস প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের শিল্পবিপ্লবের জন্য লাগসই ছিল। বরং বলা যায় সমতার ধারণাটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে মার্কসের সমাজতন্ত্র, তার আগের বিশ্ব, শিল্প বিপ্লব ও তার চতুর্থ স্তরকে অনুধাবন করতে হবে। অবশ্য আমি কোনোভাবেই এটি মনে করি না যে প্রচলিত ধারার সমাজতন্ত্র বা তার প্রতিষ্ঠা কাতালুনিয়ার বিপ্লবীদের মূল ধারণা। বরং তারা ডিজিটাল বিপ্লব বলতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সংঘটনের কথাই বলছে। নিজেদেরকে ডিজিটাল বিপ্লবের সৈনিক ভাবতে পারাটা গৌরবেরই মনে হতে পারে। মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস বাছাই করে কাতালুনিয়া অবশ্যই একটি সঠিক কাজ করেছে।

'১৯ সালেই প্রথম কাতালুনিয়া নিজেকে ডিজিটাল বিপ্লবীদের দেশ হিসেবে অভিধা প্রদান করলো। শব্দটি আমার পছন্দ হয়েছে। ইউরোপের অতি সুন্দর দেশ স্পেনের একটি প্রদেশের নাম কাতালুনিয়া। বাংলাদেশের প্রায় হাজার পনেরো মানুষ থাকে কাতালুনিয়াতে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদেও আছে হাজার দশেক বাঙালি। তবে মাদ্রিদ নয়, কাতালুনিয়া প্রদেশের রাজধানী বার্সেলোনা এখন বিশ্বের মোবাইল প্রযুক্তি প্রদর্শনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্ব অবশ্য বার্সেলোনা ফুটবল ক্লাব বা লিওনেল মেসির জন্য শহরটিকে বেশি চেনে। আমার নিজের হিসেবে সব কিছু ছাপিয়ে দেশটি এখন ফুটবল ক্লাব, মেসি আর ডিজিটাল বিপ্লবের জন্যই বেশি পরিচিত। গত প্রায় এক যুগ ধরে মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস নামক একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়ে থাকে এই শহরটাতে। চার দিনের এই আয়োজনে সারা দুনিয়া থেকে প্রায় তিন লাখ মানুষ এতে অংশ নেয়। বিশ্বের এমন কোনো প্রখ্যাত ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নেই যারা এখানে তাদের সর্বশেষ পণ্য প্রদর্শন করেনি। বাংলাদেশের উপস্থিতি এখানে খুবই কম। একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নেয়। সরকারের টেলিকম বিভাগ বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় এবং কিছু বেসরকারি আইটি প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নেয়। ৮০-৯০টি দেশের প্রযুক্তিমন্ত্রীরা, শত শত মোবাইল অপারেটর, নিয়ন্ত্রক সংস্থাসহ বিশ্বের সব প্রান্তের মানুষ এতে যোগ দিয়ে থাকেন।

আমি এই আয়োজনের সাক্ষী হচ্ছি ২০১৮ সাল থেকে। দুইবার অংশগ্রহণেই আমার কাছে এটি মনে হয়েছে, স্পেনের বিদ্রোহী প্রদেশ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিপ্লবী না হয়ে ডিজিটাল বিপ্লবী হতে পারাটা একটি অসাধারণ ভাবনা। বিদ্যমান অবস্থাতে এই কথাটি সহজেই বলা যায়, দুনিয়ার কেউ চাইলো বা না চাইলো ডিজিটাল বিপ্লবী তাকে হতে হবেই। বাংলাদেশকে তো হতেই হবে– কারণ সারা বিশ্বকে ডিজিটাল বিপ্লবের প্রথম বাণী শুনিয়েছে বাংলাদেশ। দুনিয়ার আর কার জন্য কী তা না বললেও একটি কৃষিভিত্তিক দেশকে ডিজিটাল বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে গেলে সব বাঙালিকেই ডিজিটাল বিপ্লবী হতেই হবে। শুধু কাতালুনিয়া নয় সারা বিশ্বের ডিজিটাল বিপ্লবীদের কিছু কথা তুলে ধরার জন্য এই নিবন্ধটি লেখার আয়োজন করা হচ্ছে।

নিরানন্দ আকাশ ভ্রমণ : এক সময়ে আকাশভ্রমণ আমার নেশা ছিল। ট্রাভেল এজেন্সি হওয়ার সুবাদে সারা দুনিয়া ঘোরার ফ্রি টিকেট পেতাম-ঘুরতামও সেই তালেই। কিন্তু ট্রাভেল ব্যবসায় ছেড়ে কমপিউটারের ব্যবসায় এসে দেশ-বিদেশ ঘোরার নেশাটা উধাও হয়ে গেছে। আশপাশে ছোটখাটো ভ্রমণ করলেও লম্বা ফ্লাইটের নাম শুনলেই আমি পিছুটান দিই। আগেও এমনটাই করতাম। '৯৭ সালে আমেরিকা গিয়েছিলাম ম্যাক ওয়ার্ল্ডে যোগ দিতে। মেলাটি ছিল অসাধারণ। তবে সানফ্রান্সিকো শহরের সেতুটি আর ট্রামলাইন ছাড়া ভালো লাগার কিছুই ছিল না। পাপের শহর নামে খ্যাত লাসভেগাস চুল পরিমাণও ভালো লাগেনি। সেখান থেকে বিরক্ত হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই দেশে ফিরেছিলাম। ২০০৯ সালে বিসিএসের সভাপতি হিসেবে কোরিয়া গেলাম একবার। সেবারও সিডিউলের আগেই চলে এসেছিলাম। শরীরে চিনির বাড়তি-কমতিতে ভয় পেয়ে ঘরমুখী হয়েছিলাম।

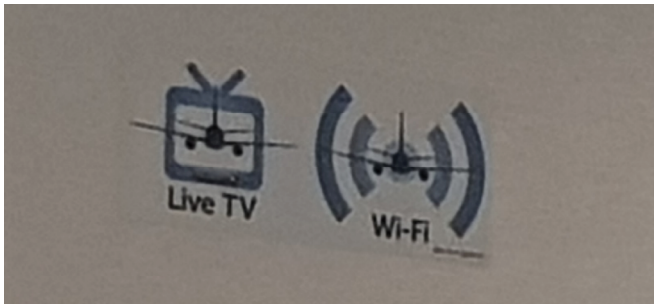

যদিও কোরিয়াতে ভালো চিকিৎসা হতে পারতো-তথাপি মনে হয়েছিল রাতে একলা রুমে হাইপো হয়ে মরে গেলে দেশটা দেখা হবে না। অবশ্য এর আগেও একবার কোরিয়া গিয়েছিলাম ব্যবসায়ের কাজে। তখন ভ্রমণের সময় পাইনি। প্রায় দুই সপ্তাহ সময় দিয়েছিলাম ইউপিএস উৎপাদন কারখানায়। ব্রিটেনে গেছি যখন, তখন ইউরোপের অন্য দেশেও গেছি। মাঝখানে একবার তাইওয়ান গেছি অ্যাপিক্টার সম্মেলনে। এই অঞ্চলের তারুণ্য ও তাদের ডিজিটাল রূপান্তর দেখার সুযোগ হয়েছিল তখন। শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড ও হংকং তো গেছি বহুবার। সৌদি আরব ছাড়া আফ্রিকা মহাদেশে যাইইনি। বিদেশ সফরের দীর্ঘতমটি সৌদি আরবেই। মাসের বেশি সময় ছিলাম। প্রতি রাতে ওমরা করতাম। এবার দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার কথা ছিল। কিন্তু স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য যেতে পারিনি। ফিলিপাইন গেছি একবার। সেটাও পর্যটন শিল্পের হয়ে সরকারি সফরে। অস্ট্রেলিয়া যাবার আমন্ত্রণ গ্রহণই করিনি। এক কথায় বলতে গেলে ভারত, থাইল্যান্ড, হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এসব দেশেই বেশি ঘোরাফেরা করেছি। ভারত মহাসাগরের দেশগুলো নিয়ে একটি ছোট ভ্রমণ কাহিনীও আছে। সানফ্রান্সিসকো ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি লিখেছিলাম। কিন্তু সেটি এখন হয়তো আর খুঁজে পাব না। '৭৫ সালে জীবনের দ্বিতীয় পেশা হিসেবে ট্রাভেল এজেন্সিকে বেছে নিয়েছিলাম তখনই আকাশযাত্রার একটি বাড়তি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু দিনে দিনে সেটি হারিয়ে গেছে। এখন আকাশে উড়তে ইচ্ছাই হয় না। দেশের ভেতরেও একটু বেশি সময় লাগলেও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আমি আকাশপথ এড়িয়ে সড়ক বা রেলপথে চলি। স্মরণ করতে পারি রেলপথের দীর্ঘ যাত্রাটি সম্ভবত জার্মানিতে। '৭৯ সালে একবার ফ্রাঙ্কফুর্ট সড়কপথে এবং মিউনিক থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট ট্রেনে এসেছিলাম। ২০০৫ সালে সিবিট মেলায় অংশ নিতে ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে ট্রেনে চড়ে হ্যানোভার গিয়েছিলাম। হ্যানোভার থেকে প্লেনে না এসে বাসে এসেছিলাম লন্ডন। হ্যানোভারের অভিজ্ঞতা ছিল অসাধারণ। মেলাটি বিশ্বের সব ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল। ছিল বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন। কিন্তু আমরা সেই বিশ্বসভায় নিজেদেরকে তেমনভাবে তুলে ধরতে পারিনি। তবে বার্সেলোনার '১৮ ও '১৯ সালের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রেক্ষিত হিসেবে অসাধারণ একটি ভূমিকা রাখবে।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নিয়ে বিদেশে প্রথম পা : '১৮ সালেই বার্সেলোনা ভ্রমণের পর রাষ্ট্রীয় কাজে একবার জাপানও গিয়েছিলাম। এক বছরে এমন দুটি লম্বা সফর এর আগের খুব সাম্প্রতিককালে আমি করিনি। '১৮ সালের অভিজ্ঞতায় ২০১৯ সালে তো নিজেই উদ্যোগী হয়ে মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ফিরলাম। এছাড়াও আমি স্বল্প সময়ের জন্য সরকারি সফরে থাইল্যান্ড সফর করি। এবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় তথ্যসমাজ সামিটে যোগ দিয়েছি। কথা ছিল মে মাসের প্রথম দিকে জাপান আইটি উইকে যাব। কিন্তু সেটি হয়নি। চীনেও যাবার কথা ছিল মে মাসে। কিন্তু মে মাসে চীনেও যাইনি। এর মাঝে সিঙ্গাপুর ঘুরে এসেছি। তবে এটি স্বীকার করতেই হবে যে সব ভ্রমণের মাঝে প্রথম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ ছিল ১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে। উইসিস ফোরাম ১৯-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতে পারাটা অবশ্যই সেরাদের সেরা। সেই সফরটি আমার জন্য ছিল অসাধারণ এক অভিজ্ঞতার ভ্রমণ। তবে এটি সত্য যে কটি সরকারি ভ্রমণ করেছি তা একদিকে আমার নিজেকে নতুন জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছে অন্যদিকে বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরে নীতিনির্ধারণে অসাধারণ সহযোগিতা করছে। বিশেষ করে সারা পৃথিবীর অভিজ্ঞতা, ভুল ভ্রান্তি, নীতি ও কর্মপন্থার সাথে আমরা আমাদের পথচলাকে মিলিয়ে নিতে পারায় ভুলত্রুটি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়ে চলছে।

২০১৮ সালে যখন প্রথমবারের মতো বিশ্ব মোবাইল কংগ্রেসে যোগ দেবার আমন্ত্রণ এসেছিল তখন আমার জন্য এটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল, মন্ত্রী হিসেবে সেখানে উপস্থিত থাকতেই হবে। এর আগে এতবার বাইরে গেছি কখনও মনে হয়নি একটি রাষ্ট্রীয় বোঝা আমার ঘাড়ে আছে। যতোই ভেবেছি ততোই দেখেছি যে নিজের মাঝে একটা বিশাল চাপ অনুভব করছি। মাথায় বারবার এটি কাজ করেছে, এখানে আমি কী বলবো, কী করবো, কোন আলোচনা করবো তার সবকিছুই আমার ব্যক্তিগত নয়। অস্থিরতাও কাজ করছিল যে রক্তে গড়া দেশটিকে সর্বত্র সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবো কি-না। অতীতে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় কাজটি তো চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠবে তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। এবার আমি দারুণ আশাবাদী ছিলাম। বিষয়টি যেহেতু আমার পছন্দের সেহেতু একদিকে সুযোগ তৈরি হয়েছিল নিজের মনোভাব সারা দুনিয়ার কাছে তুলে ধরার, অন্যদিকে এটিও ভাবনায় এসেছিল যে কাজটি সঠিকভাবে করতে পারবো কি-না। কমপিউটার বিষয়ে দেশে কাজ করছি '৮৭ সাল থেকে। বিদেশেও দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে আসছি। বিশ্বের বৃহত্তম কমপিউটার মেলা সিবিট বা ম্যাক ওয়ার্ল্ড-এ অংশ নিয়েছি। এসোসিও এবং উইটসার অনেক সভাতে যোগ দিয়েছি। দেশে অসংখ্য সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশ নিয়েছি। বাংলাদেশের হয়ে কথা বলেছি। কিন্তু এই যাত্রাই ছিল সেই যাত্রা যে যাত্রায় প্রথমবারের মতো আমার মুখ দিয়ে রাষ্ট্র কথা বলছিল– আমার আচরণ রাষ্ট্রের প্রতিফলন ঘটাচ্ছিল। প্রথম মুহূর্ত থেকেই মাথায় সেই ভাবনাটি নিয়ে চলেছিলাম।

বিশ্ব মোবাইল কংগ্রেস : যে প্রতিষ্ঠানটি এই বিশ্ব সম্মেলনটির আয়োজন করে তার নাম জিএসএম অ্যাসোসিয়েশন। প্রথমে এর নাম ছিল গ্রুপ স্পেশাল মোবাইল। ১৯৯৫ সালে জিএসএম এমওইউ নামে আজকের সংগঠনটির জন্ম হয়। এটি প্রধানত ১৯৮৭ সালে মোবাইলের জিএসএম প্রযুক্তির বিকাশে ১২টি দেশের ১৩টি মোবাইল অপারেটরের একটি সমঝোতা চুক্তির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়ানো। ১৯৯৫ সালে এর ভিত আরও মজবুত হয়। এখন বিশ্বের ৮০০ মোবাইল অপারেটর এই সংস্থার সদস্য। প্রায় ৩০০ সহযোগী সদস্যও আছে সংস্থাটির যারা মোবাইল অপারেটর নয়। জিএসএমএ পরিচালনা পরিষদে ২৫ জন পরিচালক আছেন। বর্তমান মহাপরিচালক গ্রানরিড। ভারতের ভারতী টেলিকমের সুনীল মিত্তাল '১৭ সাল থেকে ২ বছরের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেস আয়োজিত হয় বার্সেলোনার ফিরা বার্সেলোনা গ্রান ভিয়াতে। '৮৭ সালে এর প্রথম আসর বসে। '১৯ সালে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৯ হাজার। ২০০৬ সাল অবধি এটি ফ্রান্সের কানে থ্রিজিএসএমএ নামে আয়োজিত হতো। ২০১৪ সালে মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস সাংহাই নামাকরণের মধ্য দিয়ে আজকের নামটির যাত্রা শুরু হয়।

মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেস মূলত মোবাইল অপারেটরদের বিশ্ব সংগঠন জিএসএমএ আয়োজন করে থাকে। আমাদের মন্ত্রণালয়ের বিটিআরসির বড় কাজটা সেই মোবাইল অপারেটরদের নিয়ে। এই খাতে টেলিকম

বিভাগের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান আছে টেলিটক ও বিটিসিএল। এর সাথে আরও আছে তিনটি বেসরকারি মোবাইল অপারেটর। তাই এটিকে এড়িয়ে যাবার কোনো সুযোগ নেই। বিভাগের মন্ত্রী হিসেবে এমন একটি বিশ্ব সম্মেলনে না যাবার কোন যুক্তি থাকতেও পারেনা। কথা ছিল সেই বছর আইটিইউর নির্বাচনও করবো আমরা। তার মাঝে আমার জন্য একটি বক্তব্য রাখার স্লটও রাখা ছিল। কিন্তু দীর্ঘ প্লেন ভ্রমণের জন্য আমি যেতে আগ্রহী ছিলাম না। এমটবের সাবেক মহাসচিব নুরুল কবির সহ আমার দপ্তরের সবাই মিলে আমাকে সম্মত করাতে পেরেছিল, এতে যোগ দেয়া খুবই প্রয়োজনীয়। এমনকি এটিও বলা হয়েছিল, আমি যদি এই বিশ্বসভায় যোগ না দিই তবে রাষ্ট্রীয় ক্ষতি হবে। বিশেষ করে আইটিইউ নামের সংস্থায় বাংলাদেশের যে বিদ্যমান ভূমিকা আছে সেটি ক্ষতির মুখে পড়বে। ভবিষ্যতে এই সংস্থায় নির্বাচন করলে এই যাত্রাটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এখন '১৯ সালে আমি এটি বিশ্বাস করি, ২০১৮ সালে মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেসে যোগ না দিলে রাষ্ট্রের ক্ষতি না হলেও আমি নিজে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতাম। নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, সেই ভ্রমণটি না করলে এখন আফসোস করতাম। অন্য অর্থে বলা যায় যে জ্ঞান নিয়ে এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে কথা বলি তার পরিবর্তনের একটি বিশাল অংশ '১৮ সালের বিশ্ব মোবাইল কংগ্রেসে জন্ম নিয়েছে। কার্যত যেসব বিষয় নিয়ে আজকাল কথা বলতে হয় তার নতুন মাত্রা পেয়েছিলাম '১৮ সালে বার্সেলোনায় মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেসে যোগ দিয়ে। সেবার সুযোগ হয়েছিল বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীদের অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকার। ঘরভরা বিশ্বজনদের সামনে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলে প্রশংসাও পেয়েছিলাম। সেটিও ছিল জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশ দূতাবাসের নাভিদের কথা মনে রাখার মতো ছিল। প্রতি মুহূর্তে নাভিদ আমাদের সব সহায়তা দিয়েছে। সুদূর মাদ্রিদ থেকে এসে এতোটা সহায়তা করা ব্যতিক্রমী ছিল এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বার্সেলোনার পুরো অভিজ্ঞতার সাথেই নাভিদ যুক্ত ছিল। বিটিআরসির তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. শাজাহান মাহমুদ, বিটিআরসির ফয়সাল এবং এমটবের তৎকালীন মহাসচিব নুরুল কবিরের কথাও মনে রাখতে হবে। অনেকগুলো সেমিনারে যোগ দেয়া ছাড়াও ডজন খানেকের বেশি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছি বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে। জিএসএমএ, ফেসবুক, মোবাইল অপারেটরসমূহ, ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও মেলা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কাকতালীয়ভাবে সেই মোবাইল কংগ্রেসটি আর দশটি মোবাইল কংগ্রেসের মতো ছিল না। বরং সেইবারই প্রথম সারা দুনিয়াকে বড় ধরনের একটি ঝাঁকুনি দিয়েছিল ৫জি মোবাইল প্রযুক্তি। '১৮ সালে বিশ্ব মোবাইল কংগ্রেসে যারাই গিয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতাটা আমাদের চাইতে মোটেই ভিন্ন ছিল না। যে স্টলেই আমরা গিয়েছি সেখানেই দেখানো হচ্ছিলো ৫জিভিত্তিক প্রযুক্তি। চালকবিহীন গাড়ি, রোবটের উৎপাদন ব্যবস্থা, আইওটিভিত্তিক কৃষি প্রযুক্তি, ৫জিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা দেখেই যাচ্ছিলাম। বিষয়টি আমাদের পুরো টিমকে এতোটাই মোহিত করে যে আমরা মনে করি ৫জিতে কোনোভাবেই পিছিয়ে থাকতে পারি না। দেশে ফিরে এসে তাই ২৫ জুলাই '১৮ আমরা ৫জি সামিট করেছিলাম। তারই সূত্র ধরে এবার আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ২১-২৩ সালে ৫জি চালু করার ঘোষণা আসে।

ঢাকা থেকেই স্থির করা হয়েছিল বার্সেলোনার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত কর্মসূচি। যদিও শুধু মিনিস্টারস কনফারেন্সে ১০ মিনিটের একটি কী-নোট উপস্থাপনাই আমার নির্ধারিত প্রধান কাজ ছিল তথাপি সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের প্রোগ্রামও ছিল। এসব বৈঠকের অন্যতম কারণ ছিল আমার মন্ত্রণালয়-বিষয়ক বহুবিধ সমস্যার সমাধানের উপায় বের করা। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিরাপদ করা ছাড়াও ৫জি যথাসময়ে প্রচলনের ব্যবস্থা করার বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

চমকানো মন্ত্রিত্ব

বস্তুত আমার মন্ত্রিত্বটি ছিল আমার নিজের জন্য অপ্রত্যাশিত এক চমক। প্রতি বছরের মতো '১৮ সালের ১ জানুয়ারি আমি আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল গৌরীপুরে ছিলাম। আমার সঙ্গী ছিল বন্ধু জালাল। সকালে শিশুদের সাথে কথা বলে স্কুলের অধ্যক্ষের রুমে বসে আমি ও জালাল মধ্যাহ্নভোজ শেষ করছিলাম। আমার খাওয়া তখন শেষ। গৌরীপুরের দই খাওয়াটা শুধু বাকি। তখনই ফোনটা বেজে ওঠে। নাম্বারটা চেনা নয়। তবে জিপির যে সিরিজের নাম্বার সেটি একদম শুরুর দিককার। ফোন করেই তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন, তার নাম শফিউল আলম-কেবিনেট সচিব। সরাসরি জানালেন, ২ জানুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বঙ্গভবনে উপস্থিত থেকে আমাকে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে হবে। ফোনটা রেখেই জালালকে খবরটা দিলাম এবং জালালও চমকে উঠলো। কিছুক্ষণের মাঝেই তৎকালে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম একান্ত সচিব সাজ্জাদ হোসেন ফোন করে বিষয়টি নিশ্চিত করলেন।

ভাবনারও সময় ছিল না : ২ জানুয়ারি '১৮ মন্ত্রী হিসেবে শপথ ও ৩ জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরপরই আমার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কয়েকটি। প্রথমত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ৪জির নিলাম করা এবং দ্বিতীয়ত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা। মন্ত্রিত্ব পাবার দিন থেকেই প্রতিদিন শুনে আসছিলাম যে আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সহসাই উৎক্ষেপণ করা হবে। অনেক চ্যালেঞ্জ আছে যার মূল্যায়ন হয়তো অনেক পরে করতে হবে। তবে এটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে টেলিকম খাতে মন্ত্রণালয়ের সাথে যুক্ত সরকারি সংস্থাগুলোর সংকট মোকাবেলা করা পাহাড়সম উঁচু মনে হতে শুরু করে। বিভাগের সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি, বিটিআরসি এবং ক্যাবল শিল্প সংস্থা হয় সরকারের জন্য রাজস্ব আয় করে নয়তোবা লাভজনক প্রতিষ্ঠান। বিটিআরসি ও সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানির অবস্থান এমন দৃঢ় যে তাদের রাজস্ব আদায় কোনো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই বলা যায়। তবে ক্যাবল শিল্প সংস্থাকে ধন্যবাদ, তারা নিজেরা ক্যাবল উৎপাদন করে শুধু বৈদেশিক মুদ্রাই বাঁচায় না উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে মুনাফা করে। বিটিআরসির রাজস্ব নিয়ে ভাবনা না থাকলেও মনে রাখতে হয় যে দেশের টেলিকম খাত নিয়ন্ত্রণ করে সংস্থাটি। ফলে এই প্রতিষ্ঠানটির স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, নীতিমালা প্রণয়নসহ বিধিবিধান স্থির করা অতি আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। ডাক বিভাগের বা বিটিসিএলের দুর্বলতার পাশাপাশি টেলিটক বা টেলিফোন শিল্প সংস্থার ঘুরে দাঁড়ানো বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ। প্রযুক্তিগত কারণে ডাক বিভাগের উঠে দাঁড়ানো একেবারে ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়। বিটিসিএল যার ওপর ব্যবসায় করতো সেই ফিক্সড ফোন তো জাদুঘরে বিদায় নেবার পথে। ফলে এদের ঘুরে দাঁড়ানো আমাদের জন্য প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জিং। এর বাইরে তখন আমার দায়িত্বে থাকা তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের কথা এখন আলোচনায় নাইবা আনলাম।

ডিজিটাল প্রযুক্তি মেলা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ : কথা বলছি ২০১৮ সালে স্পেনের বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের প্রযুক্তি মেলায় আমার, টেলিকম বিভাগ ও আমাদের বেসরকারি মোবাইল অপারেটরদের অংশগ্রহণ করা নিয়ে। এখনকার সময়ে কোনো বিষয় বা প্রযুক্তিকে যদি সর্বোচ্চ আলোচনার বিষয় মনে করা হয় তবে সেটি ডিজিটাল সংযুক্তি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি। সেই মেলারও প্রতিপাদ্য তাই ছিল। ফলে টেলিকম বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে এই বিষয়ে কুয়োর ব্যাঙ হয়ে থাকার কোনো উপায় ছিল না। যদিও গুগল থাকতে ইচ্ছা করলেই কুয়োতে বাস করা যায় না, সব তথ্যই আঙুলের ডগায় রাখা যায়, তথাপি নিজের চোখে দেখার তো কোনো

বিকল্পই নেই। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রক্রিয়াতেই বার্সেলোনার মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে যোগদান বস্তুত আমার জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল। অভিজ্ঞতার ঝুড়ি এতো বিশাল যে এর বাইরের চ্যালেঞ্জগুলোর আলোচনা এখানে না করাই ভালো। কিন্তু যেহেতু টেলিকম বিভাগের দায়িত্ব পালন করতে হবে সেহেতু দীর্ঘ ভ্রমণের ঝুঁকি নিয়েও বার্সেলোনার ফ্লাইট স্থির করি। সব কিছুর খবরাখবর নিয়ে এমিরেটসকে আমাদের বাহক নির্ণয় করা হয়।

পেশায় এককালে ট্রাভেল এজেন্ট ছিলাম বিধায় এমিরেটস আমার অনেক চেনা নাম। এশিয়ার সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স ও মধ্যপ্রাচ্যের এমিরেটস বরাবরই আকাশভ্রমণের জগতে শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হয়ে আসছে। দুটির একটি এমিরেটসে যাবার ব্যবস্থা হওয়াতে খুশিই হয়েছিলাম। ছেলে জানিয়েছিল এমিরেটসের দুই টুকরো ফ্লাইটের মাঝে দুবাই-বার্সেলোনা অংশটি বিশ্বের নবীনতম উড়োজাহাজ এ-৩৮০ দিয়ে হবে। বিজয়ই জানিয়েছিল, এমিরেটসে ওয়াইফাই আছে। '১৯ সালে টার্কিস এয়ারলাইন্সে ভ্রমণ করতে গিয়ে দেখলাম যে ওখানেও শুধু ওয়াইফাই-ই নেই রোমিং মোবাইল কল করার সুবিধাও রয়েছে। এখন তো বাংলাদেশ বিমানেও সেই সুবিধা রয়েছে। তবে এই কথাটিও সত্য, আকাশপথ বা সড়কপথ কোনোখানেই তাদের ইন্টারনেটের অবস্থা আমাদের পছন্দ হয়নি। শুধু যেখানে ওয়াইফাই ছিল সেখানে ইন্টারনেটের গতি ভালো ছিল। হোটেল ও প্রদর্শনী স্থল দুটিতেই যেহেতু আমাদের দিনের-রাতের সময়টা কেটেছে সেহেতু ইন্টারনেট নিয়ে তেমন কোনো অসুবিধা অনুভব করিনি আমরা। তবে ইন্টারনেট ও ইউরোপে তার প্রয়োগ বিষয়ে যেসব উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিলাম সেটা তো ভেঙেছেই, হতাশও হতে হয়েছে। আমরা এখনও মনে করি, মোবাইল বা ডাটা প্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা অনেকটাই পিছিয়ে। আহা ইউরোপের কী নেটওয়ার্ক! কী অসাধারণ তার গতি! কার্যক্ষেত্রে গিয়ে কিন্তু ভাবনার শতভাগের একভাগও পাইনি। হোটেল রুমের ওয়াইফাই হোক, মেলাস্থলের ওয়াইফাই হোক বা পথচলার ইন্টারনেটের গতি হোক– কোনোটাই প্রত্যাশা পূরণ করেনি। বরং মনে হয়েছে বাংলাদেশে আমরা ভালো থাকি। নানা অভিযোগের পরও দেশে স্থির ব্রডব্যান্ড বা মোবাইল ব্রডব্যান্ড আমার কাছে ইউরোপের চাইতে অনেক ভালো মনে হয়েছে। কার্যত এখন ইউরোপকে আমাদের মতো দেশের কাছ থেকেই শিখতে হবে। আমি প্রায়ই ফেসবুকে ভারতের মোবাইল ও ডাটা নিয়ে অকুণ্ঠ প্রশংসা শুনি। জিও মোবাইলের কম দাম শুনে ফিট হয়ে যাবার মতো দশা। কিন্তু নিজে ভারত সফর করে টের পেয়েছি যতো গর্জে ততো বর্ষে না। আমাদের মোবাইলের নেটওয়ার্ক-বিশেষত গ্রামীণের খুব খারাপ। কল ড্রপ নিয়মিত বিষয়। ডাটা রেটও যথেষ্ট উচ্চ, গতি কম। তারপরেও আমাদের ঘরে-অফিসে আমাদের আইএসপিরা চমৎকার ডাটা সেবা প্রদান করে। আশা করি মোবাইলসহ ডাটা ও অন্যান্য ডিজিটাল সেবায় আমরা ইউরোপকে ছাড়িয়ে যেতে পারবো। গত কয়েক বছরে আমরা অবকাঠামোগত যেসব অগ্রগতি সাধন করেছি তাতে আমার প্রত্যাশা পূরণ হবে তেমনটা আশা করতেই পারি।

আকাশপথের ভ্রমণটাও তেমন বিরক্তিকর ছিল না, যদিও এতো লম্বা ভ্রমণ আমার অপছন্দের তালিকার শীর্ষে। আকাশপথ, ট্রানজিট এবং বার্সেলোনা বিমানবন্দরের আতিথেয়তা ছিল স্মরণে রাখার মতো। বাংলাদেশ দূতাবাস শুধু সেদিন নয় পুরো সফরটাতেই অসাধারণ সমর্থন দিয়েছে। যদিও মাদ্রিদ থেকে বার্সেলোনা এসে তাদের সব কাজ করতে হয়েছে তথাপি আমার কাছে প্রশান্তিময় লেগেছে আমাদের একখণ্ড বাংলাদেশের অনন্য মেহমানদারি ও প্রটোকল। আমাকে আগেই সতর্ক করা হয়েছিল যে বার্সেলোনায় আওয়ামী লীগ শুধু বিভক্ত নয়, সম্বর্ধনা জানাতেও মারামারি করে। কোন হোটেলে খাওয়া হবে আর কোনটাতে হবে না সেটি নিয়ে কাতালুনিয়ার বাঙালিরা একমত হতে পারে না। অতীতে কখনও কখনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে বলে আমি ঢাকায় বসেই জেনেছিলাম। আমার ও দূতাবাসের সাবধানতায় আমরা কোনো অশান্তি ছাড়াই বিমানবন্দর ছাড়তে পারি। অবশ্য সেই সফরেই আমাদের বাঙালি কন্যারা পিঠা আর চা নিয়ে আমাদের হোটেল রুমে এসে যে আপ্যায়ন করেছিল সেটি কখনও ভোলার নয়। সেদিন তারা প্রমাণ করেছিল বধূ-মাতা-কন্যারা দেশে যা বিদেশেও তাই। ওদের জন্যই পৃথিবীটা এতো সুন্দর। বস্তুত আমি অবাক হইনি যে আমাদের মাঝবয়সী কন্যারা ঘর থেকে সব ধরনের বাঙালি পিঠা তো বানিয়েছিলই এমনকি চা-ও নিয়ে এসেছিল।

'৮৭ সাল থেকে কমপিউটারের সাথে বসবাস করার ফলে তথ্যপ্রযুক্তি বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট খাত নিয়ে আমার যতোটা আগ্রহ ততোটা মোবাইল প্রযুক্তি নিয়ে ছিল না। কিন্তু ৩ জানুয়ারি '১৮ মন্ত্রীর দায়িত্ব নেবার পর অনুভব করলাম– আমার কাজের বড় অংশ জুড়ে বিরাজ করে ডিজিটাল সংযুক্তি। সাধারণভাবে ডিজিটাল সংযুক্তি নিয়ে যেসব ধারণা থাকার তা নিয়ে এর প্রচলন, সিটি সেলের মতো মোবাইল কোম্পানির জন্ম, মোবাইলের মনোপলি ভাঙা, মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার ইত্যাদির সাথে বেশ ভালোভাবেই পরিচিত আমি। এর ২জি, ৩জি বা ৪জি সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণাও রয়েছে। বিশেষ করে মন্ত্রীর দায়িত্ব নেবার পরপরই ৪জি নিলাম করা আমার অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করে। কিন্তু বার্সেলোনায় পা দিয়েই টের পেলাম এই মোবাইল মেলার সুর ভিন্ন। প্রদর্শকদের একমাত্র ক্ষেত্র ৫জি। সেমিনারের একমাত্র উপজীব্য ৫জি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে ব্লক চেইন পর্যন্ত সব কিছুর কেন্দ্র ৫জি। বলা যেতে পারে সময়টা পুরোটাই ৫জি দিয়েই কেটে গেলো। তবে সম্মেলন বলে কথা– তাও আবার সরকারি প্রতিনিধিদলসহ যোগ দেয়া। ফলে আনুষ্ঠানিকতায় ভরা ছিল পুরা সময়টাই। এমনকি ৫জির মাঝেও নানা প্রযুক্তি এসে হানা দিতে থাকে। টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাসহ ৪জি/এলটিই, ৫জি, আইওটি বেতার তরঙ্গ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্মার্ট সিটি বা আধুনিক শহর ও সমাজ ব্যবস্থা, ডিজিটাল অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে। '১৮ সালের সম্মেলনে ২০৫টি দেশ থেকে প্রায় ১০৭,০০০ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণসহ ২,৪০০টি কোম্পানির পণ্য ও সেবা প্রদর্শিত হয়। সেই সম্মেলনে ৩,৫০০টি আন্তর্জাতিক মিডিয়ার প্রতিনিধিদের প্রযুক্তির উৎকর্ষতা, ব্যবহার ও সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ বা সম্প্রচার করেছে। এছাড়া ৫জি এর উদ্ভাবন, তরঙ্গের ক্রমবর্ধমান আবশ্যকতা, গোপনীয়তা, সীমান্ত এলাকায় তথ্য-উপাত্তের গতি প্রবাহ, ধারণক্ষমতা ও সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যবহারের ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের ৭১ জন মন্ত্রী, ৮৫টি নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধানসহ মোট ১৮১টি দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার ২০০০ জনের অধিক প্রতিনিধি মিনিস্ট্রিয়াল সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া প্রায় ৬০০ জন বিনিয়োগকারীসহ মোট ২০,০০০ জনের অধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণে 'এখন থেকে ৪ বছর পরে'

নামে একটি দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়বারের মতো নারীবান্ধব প্রযুক্তি শীর্ষক সভায় মোবাইল শিল্পে লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ৪ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের সভায় স্পিড কোচিং, নেটওয়ার্কিং ইভেন্টস, ওয়ার্কশপ, মোবাইল ওয়ার্ল্ড লাইভ টিভি প্যানেলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এটিও বলা দরকার, প্রতিনিধিদলে আমার মতো মন্ত্রী ছাড়াও বিটিআরসির একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদল এবং দেশীয় মোবাইল অপারেটরদের অপর একটি শক্তিশালী দল অংশ নেয়। দলটির গঠন এতো বহুমুখী ছিল যে কংগ্রেসের সব কাজেই আমরা অংশ নিতে কোনো অসুবিধার বা রিসোর্স পারসনের সংকটে পড়িনি।

প্রযুক্তি মেলায় শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ : সফরের প্রথম দিনটা ছিল সুদীর্ঘ আকাশভ্রমণের পর বার্সেলোনায় অবতরণ, দূতাবাসসহ স্থানীয় বাংলাদেশীদের শুভেচ্ছা, হোটেলে প্রবেশ করে রাতযাপন করা। মূল কাজ শুরু হয় পরের দিন।

বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম এবং জিএসএমএ কর্তৃক ২৬ ফেব্রুয়ারি '১৮ সকাল ১১.৩০-১.০০টায় আয়োজিত সভায় বিভিন্ন দেশের মোট ২৫ জন মন্ত্রী, আইটিইউর সেক্রেটারি জেনারেল হাওলিন ঝাও, জিএসএমএ চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের ভাইস চেয়ারম্যান, বিশ্বব্যাংক, ইউরোপিয়ান কমিশন এবং উচ্চ পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। এমন একটি বিশ্বসভায় ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা ও তার জন্য নীতি প্রণয়নের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা আমার জন্য ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এ ধরনের বিশ্বসভায় সরকারকে প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারটা আমার জন্য প্রথম ছিল। সেই যে ২০০৮ সালের ১১ ডিসেম্বর হংকং এসোসিওর সভায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়টি উপস্থাপন করার পর দেশের বাইরে ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলিনি। প্রাথমিকভাবে আমার ধারণা ছিল, এই মহাপণ্ডিতদের মাঝে আমার হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্ববাসী তেমন সম্মানের চোখে হয়তো দেখে না। হেনরি কিসিঞ্জার আমাদেরকে তলাহীন ঝুড়ির দেশ হিসেবে পরিচিত করিয়ে দিয়ে গেছেন। যদিও আমাদের নেত্রী পদ্মা সেতু বানিয়ে তার সাথে মাথাপিছু আয় ১৯০৯ ডলারে নিয়ে এবং ৮.১৩ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন বাঙালি কেমন জাতি, তবুও নিজের প্রথম সরকারি প্রতিনিধিত্ব বলে একটু শঙ্কা তো আমার মাঝে ছিলই। তবে একটি আত্মবিশ্বাস ছিল, আমাদের ডিজিটাল রূপান্তরের গল্পটা সারা দুনিয়ার কাছেই চমক হিসেবে কাজ করবে। আমি তাই সেই পথটাই বেছে নিলাম। ডিজিটাল রূপান্তরে বাংলাদেশের অর্জন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলায় আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের ডিজিটাল রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনাগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশকে ডিজিটাল জাতিতে রূপান্তরের জন্য দেশের টেলিকম খাতের ভূমিকা ইত্যাদির পাশাপাশি সরকারি সেবার তৃণমূলে বিস্তার এবং সার্বিকভাবে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব তুলে ধরার বিষয়টি মাথায় রেখেই আলোচনায় অংশ নিতে শুরু করলাম। আলোচনায় মুখ খুলতেই শুনতে থাকলাম ৫জি আর ৫জি। আগেই বলেছি পুরো কংগ্রেস জুড়ে আলোচনা এবং প্রদর্শনীর কেন্দ্রই ছিল ৫জি। মন্ত্রীদের এক বৈঠকে ৫জি নিয়ে আলোচনাকালে জাপানি বক্তা বলেই ফেললেন, এই প্রযুক্তির সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুক্ত হয়ে সারা দুনিয়াতে ১.২ বিলিয়ন গাড়ি চালকের চাহিদা ফুরিয়ে যাবে। উন্নত দেশের প্রতিনিধিরা এতে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। তবে আমার কাছে মনে হচ্ছিলো, এই প্রযুক্তি আর যারই পছন্দ হোক না কেন আমাদেও তো হবার কথা নয়। আমরা প্রযুক্তির বিকাশ যতোই চাই না কেন এর বিনিময়ে বেকারত্ব চাই না। আমার দেশের সাধারণ মানুষ বর্তমানের প্রযুক্তিতেই দক্ষ নয়, ভবিষ্যতের প্রযুক্তিতে যদি তারা কর্মসংস্থান হারায় তবে সেটি দেশে-বিদেশে কর্মরত আমাদের মানবসম্পদ সংকটের মুখে পড়বে। তাই আমি মন্ত্রীদের সেই সমাবেশে বললাম, ৫জি বা তার সাথে সম্পৃক্ত প্রযুক্তি সব দেশের কাছে সমভাবে প্রযোজ্য হবে না। উন্নত বা শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য ৫জি বা চতুর্থ শিল্পবিপ্লব যে অর্থ বহন করবে, বাংলাদেশ, নেপাল, নাইজেরিয়া বা কঙ্গো-ত্রিনিদাদের জন্য সেভাবে প্রযোজ্য হবে না। আমরা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি চাই তবে সেটি মানুষের বিকল্প হিসেবে নয়। আমার বক্তব্যটি ব্যাপকভাবে দর্শকপ্রিয়তা পাওয়ায় আমিও খুশি হলাম। সুযোগটা হাতে পেয়েই বাংলাদেশ শেখ হাসিনার হাত ধরে ডিজিটাল রূপান্তরে কতোটা পথ হেঁটে এসেছে সেটি তুলে ধরতে পারলাম। আমি নিশ্চিত হলাম, বাংলাদেশের এমন অগ্রগতির কথা বিশেষত ডিজিটাল রূপান্তরের বিষয়গুলো চমকে দেবার মতো ছিল। এটি ভাবতে না পারারই কথা যে তলাহীন ঝুড়ি-খ্যাত দেশটি এভাবে ঘুরে দাঁড়াবে। শুধু তাই নয়, এমন দেশ বিশ্বের অন্য দেশকে সফলতার গল্প শোনাবে কিংবা পথ দেখাবে এমনটি ভাবাতো ভাবনারও বাইরে। আমার জন্য এই আস্থা ও ভরসা পাওয়াটা অবশ্যই একটি বড় পাওনা ছিল।

ডিজিটাল মেলায় ডিজিটাল প্রযুক্তির মুখোমুখি : মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেস বস্তুত প্রথমবারের মতো আমার সামনে সুযোগ তৈরি করে বহমান প্রযুক্তি, প্রযুক্তিধারা ও নিয়ন্ত্রকদের সাথে প্রাথমিক ও বিস্তারিত আলোচনা করার। আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক নিয়ে দৈনন্দিন সমস্যায় ভুগে আসছি। গুজব, অপপ্রচার, সন্ত্রাসের অপপ্রচার, জঙ্গিবাদের প্রসার ও সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে ফেসবুক আমাদের জন্য বিশাল সংকট তৈরি করে রেখেছে। ফলে আমাদের বিশাল আগ্রহ ছিল ফেসবুকের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার।

আলোচনার টেবিলে ফেসবুক : বার্সেলোনায় আয়োজিত বিশ্ব মোবাইল কংগ্রেসে ২৬ ফেব্রুয়ারি '১৮ বেলা আড়াইটায় আমার বৈঠক হলো ফেসবুক কর্তৃপক্ষের সাথে। সভায় ফেসবুক ব্যবস্থাপনার নীতি-নির্ধারক পর্যায়ের কর্মকর্তারা এবং ফেসবুক এশিয়া টিমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আমার মাথায় তখন ফেসবুকের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাসের বিষয়টি তীব্রভাবে কাজ করছিল। একই সাথে ফেসবুক ব্যবহার করে চলমান ডিজিটাল অপরাধের বিষয়গুলো এবং ফেসবুকের নিষ্ক্রিয়তা আমার উদ্বেগের বিষয় ছিল। ঢাকায় থাকাকালে বারবার আমরা ফেসবুকের সহায়তা চেয়েও তেমন সাড়া পাইনি। ফেসবুক সেদিন যে কথা বারবার আমাদেরকে বলেছে সেটি হচ্ছে, তাদের কম্যুনিটি মান যদি লঙ্ঘন না করে তবে তারা কনটেন্ট সরাবে না। বৈঠকে আমি সুযোগ পেলাম বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার। এমনকি আমেরিকার কম্যুনিটি মান আর বাংলাদেশের সামাজিক জীবন যে এক পাল্লায় মাপা যাবেনা, সেটি বোঝাতে চেষ্টা করলাম। আমি তাদেরকে বোঝালাম, আমেরিকায় কেউ বিকিনি পরে রাস্তায় হাঁটলে সেটি কোনো ঘটনাই নয়, কিন্তু বাংলাদেশে কেউ হাঁটুর ওপরে কাপড় তুললে সেটি ভয়ানক ঘটনা। তোমরা হলিউডের ছবিতে যা দেখাতে পারো বাংলাদেশের সেন্সর বোর্ড তার অনুমতিই দেয় না। এর চাইতে বড় বিষয় হলো বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য একটি মৌলবাদী গোষ্ঠী অবিরাম ফেসবুককে ব্যবহার করে। তারা জঙ্গি রিক্রুট

করার জন্য ফেসবুককে ব্যবহার করে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে এমন নৈরাজ্য বাংলাদেশ সরকার ও তার দেশের জনগণ মেনে নিতে পারে না। আমি হেফাজতের কাহিনীর পাশাপাশি সাঈদীকে চাঁদে দেখা যাবার গুজব এবং ফেসবুকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির অপচেষ্টাগুলো তুলে ধরলাম। ফেসবুকের কর্মকর্তারা বিষয়গুলো উপলব্ধি করলেন বলে মনে হলো। আমার সাথে আগেই পরিচিত ছিলেন অশ্বিনী কুমার নামে দিল্লিতে বসবাসরত এক ভদ্রলোক। অশ্বিনী বিষয়টি তার কর্মকর্তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হলো বলে মনে হলো। বৈঠকে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ সম্মত হলো, তারা বাংলাদেশের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে দেখবে। তাদেরকে আমরা অপরাধীদের তথ্য দেবার জন্য অনুরোধ করলে তাতেও তারা সম্মত হলো। প্রায় দেড় বছর পর যদি সেই সভাটির মূল্যায়ন করি তবে এটি বলতেই পারবো যে বৈঠকের আগের অবস্থার সাথে পরের অবস্থার আমূল না হলেও বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন রয়েছে। বিগত দেড় বছরে ফেসবুক আমাদের প্রচুর অনুরোধ পেয়েছে এবং আমাদের প্রত্যাশা শতভাগ পূরণ না হলেও আগের অবস্থার চাইতে এখনকার অবস্থা অনেক ভালো। বস্তুত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করতে পারাটাও একটি বড় অগ্রগতি। '১৯ সালে গিয়ে আবার যে আলোচনা করি তাতে অবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে। এবার আমাদের প্রত্যাশা যে ফেসবুক নিয়ে আমাদের সংকট কমে আসবে। এবার ফেসবুকের বিজ্ঞাপনে ভ্যাট আরোপ এবং আমাদের হাতে ফেসবুকের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার প্রযুক্তি আসার সুযোগ তৈরি হওয়ায় অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন প্রত্যাশা করা যেতেই পারে

৫জিময় বিশ্ব মোবাইল কংগ্রেস

বার্সেলোনায় পা রেখে অনুভব করছিলাম একটি ভিন্ন প্রযুক্তি যুগে আমরা প্রবেশ করেছি। মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেস নিশ্চিত করে, এই নগরীটি শুধু মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেসের রাজধানী হয়নি– পুরো মেলাটাই ৫জিময় হয়ে ওঠেছে। হয়তো সেজন্যই আমাদের প্রথম দিনটি প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কেটেছে। ২৬ তারিখটি এতোই ব্যস্ততাময় ছিল যে সময়ের সাথে তাল মেলানো কঠিন হয়ে পড়ে। আমার সাথে ছিলেন টেলিকম বিভাগের সাবেক সচিব শ্যামসুন্দর সিকদার, বিটিআরসির তৎকালীন চেয়ারম্যান শাহজাহান মাহমুদসহ বাংলাদেশের আরও প্রতিনিধিরা।

দুপুরে ফেসবুকের সাথে বৈঠক করেই দৌড়াতে হয় গোল টেবিল বৈঠকের জন্য। উক্ত বৈঠকে গিগাবিট ব্রডব্যান্ড, ফোরকে ভিডিও, শক্তিশালী আইওটি এবং অন্যান্য সেবা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ওয়ার্ল্ড রেডিও কমিউনিকেশন সম্মেলন-২০১৯ কে সামনে রেখে বিভিন্ন দেশের ৫জি সেবার তরঙ্গ, ৫জি সেবা সহজীকরণ এবং আইটিইউর মাধ্যমে ৫জি সেবার সমন্বয় করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গোলটেবিল বৈঠকে আগামী দিনের কর্মক্ষেত্রে রোবট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের সম্ভাবনা ও মানবজীবনে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করি আমি। আমার আলোচনা সম্ভবত একটি ব্যতিক্রমী ধারার ছিল। সবাই যেখানে এইসব প্রযুক্তির সম্ভাবনাগুলোই দেখছিলেন, আমি সেখানে এর চ্যালেঞ্জগুলোও বলছিলাম। আমার স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, প্রযুক্তি মানুষের বিকল্প নয় বরং মানুষের জীবন যাপনকে সুখকর করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে চীনাদের প্রবল আত্মপ্রকাশ : বার্সেলোনার মেলা প্রাঙ্গণে পা দিয়েই আমরা টের পেয়েছিলাম যে আমার দেখা অন্য কয়েকটি মেলার মতো নয়। দিনের শুরুতে আমরা বুঝতে পারি যে মেলার মূল সুরটা ৫জি। মেলার মূল প্রবাহ যেহেতু ৫জি, সেহেতু ৫জিকে কেন্দ্র করে কারা কী অবস্থানে আছে সেটি দেখা দরকার। আমরা খুব ভালো করেই জানি যে ডিজিটাল প্রযুক্তি বস্তুত পশ্চিম গোলার্ধের বিষয়। খোদ আমেরিকা বা ইউরোপ ডিজিটাল প্রযুক্তি উদ্ভাবনের নেতৃত্বেই আছে। কিন্তু স্বল্প সময়েই আমরা অনুভব করলাম যে ডিজিটাল প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ঠিকানাটা বদলে গেছে। সম্ভবত নেতৃত্বটা এখন চীনের দিকে। আমরা তাই চীনের দিকে তাকাতে চাইলাম।

হুয়াওয়ের সাথে বৈঠক : গোলটেবিল বৈঠক সেরেই আমরা ছুটতে থাকি চীনা কোম্পানি হুয়াওয়ের স্টলের দিকে। হুয়াওয়ে ততোদিনে আমার পরিচিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। নানাভাবে আমি জেনে গেছি, চীনের প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে ডিজিটাল ডিভাইস-টেলিকম, সংযুক্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সুপরিচিত।

হুয়াওয়ের স্টলে পা দিয়েই তাদের উদ্ভাবনী শক্তির ব্যাপক নমুনা দেখতে পেলাম। আমাদের সময়কালে বেড়ে ওঠা বাংলাদেশে প্রথমে আমরা সেরা ডিজিটাল প্রযুক্তির জন্য জার্মানীকে জানতাম। এরপর জাপান জার্মানির জায়গা দখল করে। এরপর ধীরে ধীরে কোরিয়া বা তাইওয়ান পরিচিত হতে থাকে। চীনা পণ্য বাংলাদেশে দুই নাম্বারি পণ্য হিসেবেই আসতে থাকে। কিন্তু মোবাইল ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে ধারণাটা পাল্টে গেলো। বিশেষ করে ৫জি ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তাদের উদ্ভাবন অন্য যে কাউকে চমকে দেবার মতো। হুয়াওয়ের কর্মকর্তারা বিস্তারিতভাবে তাদের প্রযুক্তির বিবরণ দিলেন। আমরা তাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করলাম। মেলার প্রথম দিনেই আমরা অনুভব করলাম যে এমন সম্মেলনে সরকারি প্রতিনিধিদলের সময়টা আসলে এয়ারটাইট। প্রতিটি সেকেন্ডকে কাজে লাগাতে না পারলে এতো অল্প সময়ে বেশি কাজ করা যায় না।

হুয়াওয়ের প্যাভিলিয়ন পরিদর্শনকালে হুয়াওয়ের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে তাদের কোম্পানির কার্যক্রম নিয়ে আমাকে অবহিত করেন। বাংলাদেশে হুয়াওয়ে ল্যাপটপ ও মোবাইলের অ্যাসেম্বলি প্ল্যান্ট বাস্তবায়নের জন্য ট্যাক্স কমানো ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার বিষয়টি হুয়াওয়েকে জানাই আমি। সেই সময়ে হুয়াওয়ের সবচেয়ে বড় একটি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা চলছিল। চীনা রেলের সাথে এস্টাব্লিশিং ডিজিটাল কানেকটিভিটি নামে আলোচনা চলমান প্রকল্প নিয়ে হুয়াওয়ের আগ্রহ ছিল ব্যাপক। প্রকল্পের অধীনে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করার একটি অংশে হুয়াওয়ের ল্যাপটপ সরবরাহ করার প্রস্তাব ছিল। আমি তাদেরকে স্পষ্ট বলে দিলাম এটি তাদের জন্য একটি বিরাট সুযোগ। ওরা এই সুবাদে বাংলাদেশে তাদের কারখানা স্থাপন করতে পারে। আমরা ততোদিনে কমপিউটার ও মোবাইলের যন্ত্রাংশের শুল্ক শতকরা ১ ভাগে নামিয়ে এনেছি। এর আগের বাজেটে সেই কাজটির পাশাপাশি রপ্তানিতে শতকরা ১০ ভাগ প্রণোদনার ব্যবস্থাও করা হয়। বলা যেতে পারে '১৭ সালে এককভাবে লড়াই করেই এতোটা অর্জন করতে সক্ষম হই। হুয়াওয়ের কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত হলো। সেই সুবাদে এই একটি প্রকল্পে আমরা ১৩১ মিলিয়ন ডলার বাচাতে সক্ষম হই। ৮০০ ডলারের ল্যাপটপকে আমরা ৫৯৫ ডলারে নামিয়ে আনতে সক্ষম হই। যদিও প্রকল্পটি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি তথাপি আমাদের সেই সফরটি বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল অর্জন ছিল বলেই আমি মনে করি। প্রাথমিকভাবে ল্যাপটপের দাম কমাতে হুয়াওয়েকে স্থির মনে হলেও পরে আমরা তাদেরকে নমনীয় হিসেবে পাই। '১৯ সালে যখন আমেরিকানদেরকে হুয়াওয়ের বিরুদ্ধে প্রযুক্তি অবরোধ আরোপ করতে দেখি তখন এটি বোঝা যায়, একদিকে হয়তো হুয়াওয়ে উদ্ভাবনে অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়েছে অন্যদিকে আমেরিকার এখন উদ্ভাবনের সেই ক্ষমতা এখন আর অবশিষ্ট নেই। '১৯ সালে বিশ্ব মেধাস্বত্ব সংস্থা ভ্রমণের পর বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে।

জেডটিইর সাথে সভা : সেদিন বিকালে অনুষ্ঠিত হয় আরও এক চীনা প্রতিষ্ঠান জেডটিইর সাথে বৈঠক। সভায় সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব শ্যাম সুন্দর সিকদার, তথ্য ও

যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সাবেক সচিব সুবীর কিশোর চৌধুরী, বিটিআরসির তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. শাহজাহান মাহমুদ আমার সঙ্গী হিসেবে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

জেডটিই কর্মকর্তারা বাংলাদেশের আইসিটি সেক্টরের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আমরা তাদেরকে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ৪ টায়ার ডাটা সেন্টার যথাযথভাবে শেষ করার প্রস্তাব করি এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে যেসব সমস্যা রয়েছে তার দ্রুত সমাধান করার আহ্বান জানাই। বস্তুত আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই যে তারা প্রকল্পটি বাস্তবায়নে শুধু বিলম্ব করছেনা বেশ কিছু অনিয়মও করছে। তারা ত্রুটি দূর করাসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে আরও গতিশীল হবারও প্রতিশ্রুতি দেয়।

জেডটিই নিয়ে আমাদের যথেষ্ট শঙ্কাও ছিল। শুধু যে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ফোর টায়ার ডাটা সেন্টারের সংকট তা-ই নয়, টেলিকম বিভাগের এমওটিএন প্রকল্প নিয়েও উদ্বেগ ছিল। যদিও তখনও প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়নি তথাপি ফোর টায়ারের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে সতর্ক করছিল। সুখের বিষয় যে আলোচনা ফলপ্রসূ হয় এবং জেডটিই তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ফোর টায়ার ডাটা সেন্টারের বিষয়ে যত্নবান হবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

মন্ত্রীদের ভাবনায় শুধু ৫জি : পরের দিন সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত মন্ত্রীদের অধিবেশনে 'গতিশীল ডিজিটাল যুগের জন্য নীতিনির্ধারণ' বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিতে হলো আমাকে। বস্তুত চতুর্থ শিল্পবিপ্লব নিয়েই কথা বলতে হলো। বাস্তবতা হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের কথা বললেই এর প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ৫জি সবার সামনে উঠে আসে। ৫জির ফলে ডিজিটাল প্রযুক্তিগুলো যেভাবে শিল্পায়ন, বাণিজ্য, ব্যবসায়, শিক্ষা, সংযুক্তি ও জীবনধারায় প্রভাব ফেলবে সেটিই সকলের আলোচ্য বিষয় ছিল। সুযোগটা পাওয়ায় একটি লাঙ্গল জোয়ালের দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের গল্পটা বিশ্ববাসীকে শোনাতে পারলাম। সবার কাছেইতো অবাক লাগার কথা যে বাংলাদেশের মতো একটি দেশ দুনিয়ার সবার আগে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করতে পারে। এটি আরও অবাক করার মতো ছিল যে দেশটি শুধু ঘোষণা করেই বসে থাকেনি বরং এর রূপান্তরে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে এবং অন্য বহু সমগোত্রিয় দেশকে অতিক্রম করতে পেরেছে। আমাদের উত্থাপিত সূচকগুলো সবাইকে চমকে দিচ্ছিলো। বৈঠক থেকে অনুভব করলাম বাংলাদেশ তার ডিজিটাল রূপান্তর নিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে অতি সুপরিচিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন দেশের মন্ত্রীরা আগ্রহ নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে আমাদের ডিজিটাল রূপান্তর বিষয়ে বহুবিধ প্রশ্ন পেতে থাকলাম। সরকারি সেবার ডিজিটাইজেশন থেকে তৃণমূলে সেবা পৌছানো মন্ত্রীদের আকর্ষণের বিষয় হতে থাকলো। মন্ত্রীদেরকে স্বেচ্ছায় চা-কফির আড্ডায় পেতে শুরু করলাম। আগ্রহ দেখলাম টেলিকম সেক্টর নিয়েও। বাংলাদেশের টেলিকম এতো দ্রুত প্রসারের বিষয়টি জানার আগ্রহ ছিল নেপাল-ভুটানের মতো দেশগুলোর। মাত্র কদিন আগে নিলাম করা ৪জি নিয়েও কথা হলো। বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে উল্লেখ করেন এবং ডিজিটাল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে টেলিকম সেক্টরের ভূমিকাও তুলে ধরি।

বিশ্ব মোবাইল কংগ্রেস ও গাউডির গির্জা : ২০১৮ সালে বার্সেলোনার বিশ্ব মোবাইল কংগ্রেস আমাদেরকে ৫জিসহ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, ব্লক চেইন ইত্যাদি নিয়ে বিশ্বের সেরা কোম্পানিগুলোর সাথে আলোচনা করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। বিশেষ করে চীনা কোম্পানিগুলো এবং ৫জির প্রতি সারা দুনিয়ার ঝোক আমাদের পুরো ভ্রমণ কালটাকেই আপ্লুত করে তোলে। তবে আমরা শুধু চীনাদের দিকেই তাকিয়ে থাকিনি। বরং চীনাদের পাশাপাশি এরিকসন, ই-ডটকো, কোয়ালকম, নকিয়া ইত্যাদি কোম্পানির সাথেও আমরা প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলেছি। একই সাথে আমরা কথা বলি আইটিইউর মহাসচিব হাওলিন ঝাও এবং জিএসএমএ ও সবার জন্য ইন্টারনেট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে। আনন্দের বিষয় ছিল বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান রিভ সিস্টেমস এর স্টল দেখা। তবে প্রযুক্তির অসাধারণ আলোচনার মাঝে স্থাপত্যের এক উজ্জ্বল আলো যার নাম গাউডির গির্জা, সত্যিকারভাবেই আমাদেরকে মুগ্ধ করে।

এরিকসনের প্যাভিলিয়নে : দুপুর ১২টার দিকে বৈঠক হলো এরিকসনের সাথে। তারা দেখালো তাদের ৫জি প্রযুক্তি। এর আগে ৫জি প্রযুক্তির চমৎকারিত্ব আমরা হুয়াওয়ের স্টলে দেখে এসেছি। এরিকসন হুয়াওয়ের আমেজটাকে অতিক্রম করতে পারলো না। আমরা প্রায় সবাই অনুভব করলাম যে এরিকসনকে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে। বস্তুত এরিকসনের সাথে আমাদের তেমন কোন ইস্যু ছিল না, তাই লম্বা আলোচনারও প্রয়োজন হয়নি।

ই-ডটকো : দুপুর সোয়া ২টায় দেখা হলো ই-ডটকো নামের একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে। তারা বাংলাদেশে মোবাইলের টাওয়ার বানায়। এটি মালয়েশিয় প্রতিষ্ঠান এক্সিয়াটার প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের রবি তাদের সহযোগী। এবার টাওয়ার নিলামে চারটি কোম্পানি যে লাইসেন্স পেয়েছে তাতে ই-ডটকোও একটি। তারা সরকারের সহযোগিতার আশ্বাস চাইলো।

আইটিইউর মহাসচিব হাওলিন ঝাও-এর সাথে সভা

আইটিইউ বা আন্তর্জাতিক টেলিকম ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেক পুরনো। সেই ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সংস্থাটির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। বস্তুত এই সংস্থাটি সারা বিশ্বের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। সেই ফিক্সড ফোনের যুগ থেকে ৫জি পর্যন্ত সব কিছুই এই সংস্থাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। ফলে এই সংস্থার মহাসচিব হাওলিন ঝাও এর সাথে বৈঠক করাটা টেলিকম মন্ত্রী ও সঙ্গীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঐদিনের পরের দুটি মিটিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিকাল সাড়ে ৩টায় আইটিইউর মহাসচির হাওলিন ঝাওয়ের সাথে বৈঠক হলো। ঝাও বাংলাদেশের এক অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি বাংলাদেশ সফর করেছেন। বাংলাদেশের তথ্য আপা তার মাথার মাঝে গেঁথে আছে। আমাদের ডিজিটাল রূপান্তর তার কাছে অন্য যে কোনো দেশের জন্য অনুকরণীয় বলে জানালেন তিনি। আমরা তখন ভেবেছিলাম যে আইটিইউতে নির্বাচন করবো। আমাদের ইচ্ছার কথা জেনেই ঝাও বাংলাদেশকে সমর্থন প্রদানের আশ্বাস দিলেন। বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরের ব্যাপক প্রশংসা করলেন তিনি।

জিএসএমএ'র সাথে বৈঠক : বিকাল পৌনে ৫টার বৈঠকটি ছিল জিএসএমএ'র সাথে। সভায় জিএসএমএ'র এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রধান, উপদেষ্টারা এবং সিনিয়র পরিচালকেরা উপস্থিত ছিলেন। আমার নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জিএসএমএ বরাবরই মোবাইল অপারেটরদের স্বপক্ষে কথা বলে। বস্তুত এটি অপারেটরদের বিশ্ব সমিতি। বাংলাদেশের নিয়ম নীতি, স্পেক্ট্রাম দাম ও অন্যান্য বিষয় তাদের আলোচনায় ছিল। জিএসএমএ প্রতিনিধিরা Ernest & Young (E & Y) নামের ট্যাক্স অ্যাডভাইসরি ফার্মের সম্পন্ন করা তাদের অনুমোদিত ট্যাক্স স্টাডি রিপোর্ট এবং মোবাইল ফর ডেভেলপমেন্ট ন্যাশনাল ডায়ালগ সম্পর্কিত বাংলাদেশের প্রতিবেদনে প্রকাশ করার পরিকল্পনা বিষয়েও আলোচনা করেন। এছাড়া দ্বিপাক্ষিক সভায় ৪জি অকশন, ইনফ্রাস্টাকচার শেয়ারিং, ইএমএফ রেডিয়েশন এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল আইডি

প্রদানের ক্ষেত্রে ব্লক চেইন প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এর মধ্য দিয়েই আমাদের ২৭ ফেব্রুয়ারি '১৮ কেটে যায়। মেলা থেকে বের হয়ে শুধু সবাই মিলে রাতের খাবার গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন কাজে মনযোগী হবার উপায় ছিলনা আমাদের। পুরো দিনের ধকল শেষে শান্তির ঘুমে রাত পার হলে সকালে নাশতা সেরে পরের দিনটা শুরু হলো বেলা আড়াইটায়।

সবার জন্য ইন্টারনেট : ২৮ তারিখ বসি আমরা সবার জন্য ইন্টারনেট নিয়ে আলোচনা করতে। Alliance for Affordable internt (A4AI)-এর সাথে অনুষ্ঠিত এই সভায় A4AI এবং তার উচ্চপর্যায়ের পলিসি পার্টনাররা A4AI লক্ষ্য/উদ্দেশ্য জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য একসাথে কাজ করার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। এছাড়া ২০১৭ সালে Alliance for Affordable internet-এর প্রভাব এবং ২০১৮ সালের কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করা হয়। বিষয়টি নিয়ে ঢাকায় বসেও একবার আমার সাথে আলোচনা হয়েছিল। তাই আমরা বিষয়টিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম। বস্তুত আমার ভাবনার সাথে এই ভাবনাটির দারুণ মিল আছে। আমি নিজে বিশ্বাস করি দুনিয়াটা ইন্টারনেটের। আগামীতে এটি আরও বেশি ইন্টারনেটনির্ভর হবে। সেই ইন্টারনেট সবার কাছে পৌঁছাতে হবে এবং সবার ক্রয়ক্ষমতার মাঝে এর মূল্য থাকতে হবে। এই আলোচনার পরপরই আমরা চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান জেডটিইর সাথে আলোচনায় বসি।

কোয়ালকম ও নকিয়া : কোয়ালকম আর নকিয়ার সাথে বসার আগে আমরা চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান জেডটিইর সাথে বসি। আমরা কোয়ালকম এবং নকিয়ার সাথে প্রধানত ৫জি প্রযুক্তি বিষয়ে কথা বলি। যেহেতু পুরো মেলাতেই আলোচ্য বিষয় ছিল ৫জি এবং প্রদর্শনীর মূল কেন্দ্রটাও ছিল ৫জি সেহেতু ওরাও তাতেই আগ্রহী ছিল। বস্তুত তাদেরকে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করাটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কোয়ালকম তাদের আগ্রহ প্রকাশ করে। নোকিয়া বাংলাদেশের টেলিকম খাতে আগে থেকেই কাজ করছিল। ফলে ৫জি তাদের আকর্ষণের জায়গায় অবস্থান করে।

একখণ্ড বাংলাদেশ : দিনের শেষ কর্মসূচিটি ছিল বাংলাদেশের একমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান রিভ সিস্টেমের স্টল দেখা। বেশ কিছুটা পথ হেঁটে রিভ সিস্টেমের স্টলে গিয়ে এর মালিক স্নেহভাজন রেজাকে পেলাম। রেজা বস্তুত বিশ্ব মোবাইল মেলায় একখণ্ড বাংলাদেশ। অন্যরা যখন দল বেঁধে প্যাভিলিয়ন তৈরি করে তখন আমাদের শুধু রিভ সিস্টেম ছাড়াও আর কাউকেই আমরা পাইনি। রেজা আমাদেরকে তার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিলেন। খুশির খবর হলো যে এই মেলা থেকে তারা সারা বিশ্বে গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারে। '১৮ সালের অভিজ্ঞতাও চমৎকার জানিয়ে রেজা বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারলো বলে গর্বিত সেই কথাটি জানালো। রিভ সিস্টেম বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির সফলতার এক বিশাল দৃষ্টান্ত। বিশ্বের অনেক মোবাইল অপারেটর তাদের সফটওয়্যার ব্যবহার করে। তাদেরই আছে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার। আমরা জানি যে আয়ারল্যান্ডের পুলিশ রিভ অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার ব্যবহার করে। রেজাকে বুকে নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা মেলা ছেড়ে হোটেলের পথে রওনা দিই।

প্রাসঙ্গিকভাবে এই কথাটিও বলা দরকার, আমাদের প্রতিনিধিদলটি ছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের একটি প্রতিনিধিদল বিশ্ব মোবাইল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল। তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমদ পলকের নেতৃত্বে সফররত প্রতিনিধিদলটিকে আমরা মেলায় ২/১ বার দেখেছি। তবে একবার তথ্যপ্রযুক্তি সচিবকে আলোচনায় পাওয়া ছাড়া

তাদের কর্মসূচিগুলো আলাদাই ছিল। আমাদের দলটির একটি বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল বাঙালি খাবার খাওয়ার। আমাদের সেই স্বপ্নও পূরণ হয়েছিল। বাংলাদেশের বাঙালিদের হোটেলেই আমাদের খানাপিনা হয়েছে।

অবাক করার বিষয় ছিল মেলার ব্যবস্থাপনা। এতো বিপুলসংখ্যক মানুষের ব্যবস্থাপনা চিহ্নিত করার মতো কোনো ত্রুটি আমরা খুঁজে পাইনি। ভিভিআইপি গাড়ি পার্কিং হোক আর চেক ইন হোক, কিংবা হোক চা-কফির ব্যবস্থা– কোথাও কোনো খুত খুঁজে পাইনি।

গাউডির গির্জা : বার্সিলোনা অবস্থানকালে আমাদের একমাত্র দর্শনীয় স্থান ছিল অ্যান্থনি গাউডির গির্জা। সাগ্রাডা ফেমিলিয়া নামে গির্জাটি পরিচিত। এটি এখন ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য অঞ্চল। গির্জাটির স্থাপত্য নকশা করেছিলেন কাতালুনিয়ান স্থপতি অ্যান্থনি গাউডি (১৮৫২-১৯২৬)।

১৮৮২ সালে ফ্রান্সিসকো ডি পলা দেল ভিলার নেতৃত্বে গির্জার নির্মাণকাজ শুরু হয়। তবে ১৮৮৩ সালেই গাউডি এর প্রধান স্থপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গির্জার নির্মাণকাজ শুধু ব্যক্তিগত দানে চলতে থাকে। স্পেন যুদ্ধে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৩৬ সালে বিদ্রোহীরা এতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই আগুনের ক্ষত মেরামত করতে ১৬ বছর সময় লেগে যায়। বলা হয়ে থাকে যে ২০১০ সালে গির্জার অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং '২৬ সাল নাগাদ এর কাজ শেষ হবে। '২৬ সালে গাউডির মৃত্যুর শতবর্ষ পালিত হবে। গির্জাটি দেখতে পারা একজন সৃজনশীল মানুষের জন্য এক বিশাল পাওনা। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পাশাপাশি স্থাপত্য বিদ্যার এমন অপূর্ব সমন্বয় দুনিয়ার আর কোথাও আছে কি-না তাতে সন্দেহ আছে। আমার নিজের কাছে মনে হয়েছে এমন একটি অভূতপূর্ব সৃষ্টি আমি আর কখনও দেখিনি। তখন অবশ্য বারবার আমার মনে হয়েছে ছোট মেয়ে তন্বীর কথা। সে স্থাপত্য বিদ্যায় সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। তার দেখা উচিত ছিল এই অসাধারণ স্থাপত্যটি। এটি দেখার জন্য দল বেধে মানুষ আসে। কাকতালীয় হলেও এটি অদ্ভুত যে আগন্তুকদের বেশির ভাগই তরুণ তরুণী। কেউ বার্সেলোনা গেলে গাউডির গির্জা না দেখে আসবেন না। আমি নিশ্চিত দুনিয়ার আর কোথাও এর কোনো বিকল্প নেই।

পরদিন আমরা বার্সেলোনা ছেড়ে আসি। মাত্র কয়েকটি দিনের ব্যস্ততম কর্মকাণ্ড, অভাবনীয় মতবিনিময়, জ্ঞানবিনিময় এবং নিজের চোখে বিশ্বের নবীনতম প্রযুক্তি দেখার পুরো বিষয়টাই ছিল স্মরণীয়। আমার জন্য পুরো বিষয়টিই ছিল ভাবনারও অতীত। এতো অল্প সময়ে এতো গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে মতবিনিময় করার চাইতেও চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যে রোবট কেমন করে সরাসরি কাজে লাগে বা উচ্চ গতির ইন্টারনেট মানুষের জন্য কতোভাবে সেবা দিতে পারে কিংবা কেমন করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে জনকল্যাণে ব্যবহার করা যায় তা আর যাই হোক ঘরে বসে ইন্টারনেট ঘেঁটে আয়ত্ত করা যায় না। বার্সেলোনার সেই স্মৃতি বহুদিন অমলিন থাকবে শুধু মোবাইল বিশ্ব কংগ্রেসের জন্য নয়, বরং গাউডির গির্জা এবং পরিচ্ছন্ন, অপরূপা এক নগরীর স্মৃতিগুলো। যদিও শহরটির কোনো কিছুই দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি তথাপি যে এল প্যালেস হোটেলটিতে ছিলাম তার অসাধারণ আতিথেয়তা এবং কাতালুনিয়াবাসীর মার্জিত, অমায়িক আচরণ মনে রাখতেই হবে। সেবারই স্থির করেছিলাম যে এর পরেরবারও আবার আসবো বার্সেলোনার বিশ্ব মোবাইল কংগ্রেস দেখতে। কারণ সঠিকভাবেই ধারণা করেছিলাম যে পরের বছর প্রযুক্তির পূর্ণতা আরও সমৃদ্ধ হবে। বস্তুত সেটাই দেখেছি '১৯ সালে কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com